রবীন্দ্র - দৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজ

অশোককুমার রায়

অনন্ত আকাশ আর আলো অন্ধকারের বিচিত্র পর্যায়ে যে আনন্দ বর্তমান, তার উপলব্ধিতে অমৃতত্বের যে আস্বাদ তাকে গ্রহণ করতে হ'লে প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার স্তবে স্তরে সুশৃঙ্খলা আর নিয়মতন্ত্রের প্রকাশ প্রয়োজন এবং তার ব্যবস্থা করাই সমাজের কর্তব্য। সামাজিক জীবনের এই শৃঙ্খলা আর সুপরিচালনাই দৈনন্দিন মুহূর্তগুলিকে আনন্দ মুখর আর শান্তিপূর্ণ করে তোলে। তাই পার্থিব জীবনেসামাজিক জীবনের প্রয়োজন অসামান্য। এই অসামান্যতাই যুগে যুগে সমাজের একঘেয়েমি বা অলক্ষ্য পরিবর্তনগুলির সংস্কারে সমাজকর্তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে। সমাজ হিতচিন্তায় যাঁরা মগ্ন হয়েছেন --- তাঁদের নির্দেশে সমাজের রূপও তাই বিভিন্ন আকার নিয়েছে। আধুনিক কালের সমাজ সংস্কারক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াস সামান্যের স্তর থেকে বহু উর্ধে, তাই তাঁরদৃষ্টিতে আমাদের নব সমাজের রূপ বা পুরাতন সমাজের নবীকরণ যে আকার নিয়েছে, সে অবয়বের যে একটা বিশেষ প্রকৃতি ও আবেদন আছে তাকে আমাদের গবেষণারঅন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ যে সমাজ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার শু বৈদিক যুগ থেকে। সমাজে সুখ ছিল, স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, আনন্দ ছিল --- তারা প্রাণমন খুলে প্রার্থনা করতে পারত ঃ

"ঊষো যদদ্য ভানুনাবি দ্বারা বৃনবো দিব ।
প্রনো যচ্ছতাহবৃকং পৃথু ছর্দি প্র দেবী গোমতীরিষ।"

(অয়ি ঊষা! তুমি আজ জ্যোতিচ্ছটায় আকাশের দ্বার খুলে দিয়েছ। তুমি আমাদের হিংসকরহিত অন্ন দাও। গো - যুক্ত প্রশস্ত গৃহ দাও।)

সেই বহু পুরাতন সমাজ, যা অতীতে সৃষ্ট হয়েও আধুনিক, অযুত বর্ষের প্রাচীন হয়েও সকল কালের চির নতুন, ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক পটভূমিকার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রূপ পাল্টে আজও তার নিজস্ব সত্ত্বা নিয়ে বেঁচে আছে। ভারতের এ'সমাজের একটা বিশেষত্ব আছে, একটা ক্ষমতা আছে, একটা আবেদন আছে। যার জন্য মিশরীয়, এ্যাসিরীয়, গ্রীক্, পারসীক, রোমীয় সমস্ত সভ্যতা বিলীন হয়ে গেলেও অসীম প্রাচীনত্ব নিয়ে, অনন্য সাধারণ বন্ধন প্রণালী নিয়ে এ'সমাজ আজও আমাদের কাছে গ্রহণীয়, পালনীয় রূপে অবস্থান করছে। অনিবার্য নানা কারণে এর রূপ পাল্টাবার যে একটা ব্যর্থ প্রয়াস সমাজের উপর করতে চলেছে তা' থেকে মুক্ত থাকতে কিছু নবীনকরণ, কিছু বর্জনের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজের পুনর্গঠনে প্রবৃত্ত হন। তিনি জানতেন আদিত্যবর্ণ পুষকে শরণ করে এই অমৃতের পুত্রদের জন্য যে সমাজ - ব্যবস্থা ও জীবন দর্শন প্রাচীন ভারতবর্ষ দিয়েছে, তার একটা শাশ্বত আবেদন আছে। এ'সমাজ স্ফটিক বিচ্ছুরিত বর্ণ বিশ্লেষণের ছটা ঝলমলে স্বর্ণপাত্র নয়, যার মধ্যে মাটির ঢেলা রয়েছে, বরং বলা যায়, এর মধ্যে রয়েছে বৈরাগ্যের অনাড়ম্বর আদর্শ বিঘোষিত অদ্বৈত আনন্দের প্রাণনির্ঝর বাস্তব পথ। সমাজের হস্তক্ষেপ এখানে সংযম, শৃঙ্খলা আর শান্তির কারণ হয়ে আছে। এর শৈথিল্য জীবনের গতি ও অবস্থানকে শঙ্কিত করে তোলে। তাই রবীন্দ্রনাথের সমাজ চিন্তার ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত হয়েছে "আমাদের সমাজ 'নেশন' গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না। আমাদের সভ্যতার মূল সমাজ।" রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের আধুনিক সমাজ মূলতঃ সেই বৈদিক সমাজেরই নূতন রূপ ভিন্ন কিছুই নয়। এর মধ্যে নব সভ্যতার লৌহ, লোষ্ট্র, কাষ্ঠ, প্রস্তরের প্রাধান্য যত আছে তা অপেক্ষা অনেক বেশি রয়েছে সেই অরণ্য বাণী সম্বলিত গ্রামীণ জীবনের সুর। যার মধ্যে ছিল না আড়ম্বর, ছিল না উল্লাস ছিল না উত্তেজনা। শান্ত, সুখের নীড়ে সুব্যবস্থার একটা আবহাওয়া সমস্ত জীবনটাকে শীতল - সুন্দর করে রেখেছিল। ভারতীয় সমাজ প্রথম আঘাত পায়বিদেশী আক্রমণে। রাজনৈতিক আবহাওয়া সমস্ত দেশের ওপর দিয়ে ঝড় বইয়ে গেল বার বার, ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল। কিন্তু সামাজিক কাঠামো অক্ষুন্ন রইল। যেন একটা ছায়া সবকিছু আগলিয়ে রইলো, কিন্তু সবই রইলো অপরিবর্তিত, অবিচ্ছিন্ন। বৈদিক সমাজ ব্যবস্থা খ্রীষ্টপূর্ব ১১০০ অব্দ পর্যন্ত প্রায় একই রকম ছিল। গুর্জর আক্রমণে এই সমাজের নানাভাবে পরিবর্তন হয়। ৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদের আক্রমণের সময় ঐতিহাসিক আলবেণীর গ্রন্থে সমাজের পরিবর্তনের নানা ইঙ্গিত দিয়েছেন। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সুলতানী আমলে সামাজিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে একবার রামানন্দ, চৈতন্যদেব প্রভৃতি যুগপুষদের প্রভাবে। পর্তুগীজ পর্যটক পা - এস ও বারবোসা এই সময়ের সমাজ ব্যবস্থা খুবই উন্নত বলে জানিয়েছেন তাঁদের রচনায়। রবীন্দ্রনাথ সেই উন্নতি সম্বন্ধে লিখেছেন, "সমাজে কাহার হস্তক্ষেপ নাই। তাই রাজ্যশ্রী যখন দেশ হইতে বিতাড়িত, সমাজশ্রী

তখন বিদায় গ্রহণ করে নাই।"

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমনে আমাদের সমাজের উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার রজত চমকের প্রথম স্পর্শ লাগে। সমাজিক ভিত্তি এই প্রথম ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হয়। বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রবেশ সামাজিক জীবনের আমূল ধারাকে পালটে ফেলার জন্যে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই যুগধর্মমুখীনতা আমাদের সমাজের উপর সর্ববৃহৎ আঘাত। রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কারও এই সূচনা। কারণ

Happiness is the only good,
The time to be happy is now,
The place to be happy is here.

---এই বাণীই প্রধান হয়ে দেখা দিল।

অসহিষ্ণু প্রকৃতি ও সুখলালসাপূর্ণ জীবন রবীন্দ্র দৃষ্টিতে বর্জনীয়। মানুষের লক্ষ্যের এত ক্ষুদ্রত্ব রবীন্দ্রনাথের সমাজব্যবস্থায় স্থানপায়নি। তাঁর মতে "জ্ঞানের অধিকার, ধর্মের অধিকার, তপস্যার অধিকার, আমাদের সমাজের যথার্থ প্রাণের আধার।" অন্তশাসনের শাসিত শান্তির সমাজই আমাদের সমাজ। আনন্দহীন সুখের সমাজ আমাদের নয়। তাই ঋণং কৃত্বা, ঘৃতং পিবেৎ, ভস্মীভূতস্যদেহস্য পুনরাগমনংকুত - এই মতবাদকে তিনি স্বীকার করেননি। তিনি লিখেছেন, "সমাজ শুধু ঐহিক সুখের জন্যই নয়। পারত্রিক পরিণতির জন্যপার্থিব জীবনেও আত্মচর্চার সুব্যবস্থা করা সমাজের কর্তব্য। মেনমীয়স্ বলেছেন, "মানুষের ত্রমোন্নতি সংযম ও ধর্মের পথে, লোভ ও অধর্মের পথে নয়। অর্থাৎ শুদ্ধ প্রবৃত্তির পথে চিরস্থায়ী, উন্নতি হয় না।" কনফুসিয়স ইহার প্রয়োজনেই মানুষকে সামাজিক হতে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথও সমাজের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠপ্রয়োজন এই জন্যই নির্দিষ্ট করেছেন।

সমাজ বৈশিষ্ট্যের মূল নির্ভর হল, 'সর্বাধিকারিত্ব,' 'সম্মিলিতাধিকারিত্ব', 'পৃথগাধিকারিত্ব' -এই তিনটির বিভিন্ন অবস্থান। রবীন্দ্র দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে দ্বিতীয়টির প্রাধান্যই আমাদের সমাজের ভিত্তি। বিশাল দেশ আর বহুসংখ্যক জনসাধারণের মধ্যে কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "অন্নসাধনার ক্ষেত্রে কৃষি সাধনাই মানুষকে ব্যক্তিগত খন্ডতা হইতে বৃহৎ সম্মিলিত সমাজের ঐক্যে উত্তীর্ণ করিতে পারিয়াছিল।" নেপোলিয়নের মতে "কৃষিসূত্রক সাম্রাজ্য বাণিজ্য সূত্রক সাম্রাজ্য অপেক্ষা সহজে সংস্থাপিত এবং সততই দৃঢ়তার।"

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমাজকে দৃঢ়তর করবার মানসেই শহরের যক্ষপুরীর আকর্ষণ কমাতে বলেছেন। রবীন্দ্রমানসে প্রাচীন ভারতের মূর্তির সঙ্গে বর্তমান ভারতের মূর্তিও

"হেথা মত্ত স্ফীত স্ফূর্ত ক্ষত্রিয় গরিমা।
হেথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণ মহিমা।"

এ চিত্র অতীত ভারতের ঠিকই। রবীন্দ্রনাথের কামনা, "সে আসন অনেককাল প্রস্তুত হয় নাই।" এ'চিত্রের অনবস্থানের কারণ "শ্রীকে তাহার অন্নক্ষেত্রে আবাহন করিতে অনেক কাল ভুলিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে সৌন্দর্য গেল, স্বাস্থ্য গেল, বিদ্যা গেল, আনন্দ গেল; প্রাণও অবশিষ্ট আছে অতি অল্প।" সমাজের অর্থনীতির দিকটির সংস্কার তাই প্রথমেই প্রয়োজন।

আমাদের সামাজিক বিভাগ যাহাকে আমরা জন্মগত বলে ভুল করে আসছি তার ত্রমাবনতি রবীন্দ্রনাথকে চিন্তান্বিত করেছে। অবশ্যম্ভাবী শ্রেণী বিভাগের প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন নাই। "গুণকর্ম বিভাগশ " চতুবর্ণের সৃষ্টি তিনিও সত্য বলে গ্রহণ করেছেন।" তাই শ্রমবিভাগ যেমন বর্তমান কালের একটি সার্থক মতবাদ, শ্রেণী বিভাগও তেমনি সুশৃঙ্খল সমাজ পরিচালনার অঙ্গ।যান্ত্রিকতার অমোঘ প্রভাবে এ'বিভাগ লুপ্ত হবার উপত্রম হলেও সামাজিক নিয়মে এমন একটা স্তর ধরে রাখবার ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেছেন। সমাজ রক্ষা ও পরিচালনার তাগিদেই তিনি জ্ঞানের চূড়ান্ত শিখরে আরোহী ব্রাহ্মণ কুলকে সমাজ কর্তারূপে নির্দেশ করেছেন। বলেছেন, "সমাজ ইহাদিগকে সেই অবসর, সেই সামর্থ্য, সেই সম্মান দেয়।" ব্রাহ্মণত্বের এ'সম্মান আমাদের দিতে হবে। বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব আমাদের সামাজিক সংকীর্ণতা বাড়িয়েছে। বাড়া - বাড়ির সীমা সেই যে বর্ধিত হয়েছে তাইই নানা সংস্কার কুসংস্কারে জর্জরিত হয়ে বর্তমানের অবহেলা কুড়াচ্ছে। কারণ, সমাজের প্রত্যেকের স্ব - স্ব অধিকার নিয়ন্ত্রণ করে দিলে বৃথা বিচ্ছেদ আসে না। বর্ণ বিভাগের নামে যদি মানবিকতার অধিকারে বাধ সাধে তবে সে বিভাগকে রবীন্দ্রনাথ কামনা করেননি। মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ যেন প্রতিটি স্তরের প্রতিটি মানুষ লাভ করতে পারে। শুধু সামাজিক কাজ প্রত্যেকের উপর ভাগ করা থাকবে। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণকে সাবধান করে লিখেছেন, "কিছু আদায় করিতে হইবে এই মন্ত্র ছাড়িয়া কিছু করিতে হইবে, কিছু দিতে হইবে এই মন্ত্র লইবার সময় আসিয়াছে। আরও বলেছেন, "রাষ্ট্রনীতি ঈর্ষা, প্রতারণা, মানুষে এত হীনতা। তাই প্রত্যেক সমাজের পুনর্গঠনের সবচাইতেবড় ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন, এই-- "জাতীয় ভাব সংশোধনের জন্য সমাজের আত্মপ্রকৃতি বুঝিয়া চলিতে হইবে, আত্মবিশ্লেষণ প্রযোজনীয় হইয়া দাঁড়াইবে।" যে জিনিসটি আমাদের সমাজে অভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার অবলুপ্তি সমাজকে দুর্বল করছে, তার পূরণ ভিন্ন উন্নতির আশা ক্ষীণ। আপন পরের সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা আমাদের মধ্যে ভাঁটা পড়েছে। স্বার্থ প্রাধান্য

পেয়েছে, পরার্থ বিদায় নিয়েছে। একে অন্যের সম্পর্ক আমরা অস্বীকার করতে শিখেছি। সমাগ্রিকভাবে, সামাজিকভাবে আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি। পরস্পরের হিতচিন্তাকে পুনর্গ্রহণ রবীন্দ্র দিক থেকে সমাজ সংস্কারের অন্যতম প্রধান প্রয়োজন।

আমাদের সামাজিক জীবনে বৃথা মোহের একটা বেলেস্ত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক সম সমাজে এই বৃথা বাহবার লোভম ানসিক ও শারীরিক সামর্থ্যের উপর একটা অভিশাপ ডেকে এনেছে। বাহবা প্রীতির আশু সংস্কার ভিন্ন ব্যক্তিগত চির অধ পতনকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। নিজের ক্ষমতাকে আমরা অপ্রয়োজনের প্রতি অযথা ব্যয় করছি।

এই অসমর্থনীয় প্রীতিবহুলতা আমাদের সমাজকে অনেকাংশে ধনদাসত্বের দ্বারে উপনীত করেছে। আমরা তাই সমাজে নিজেদের স্থান সম্বন্ধেনা ভেবেই লোভাতুর দৃষ্টিতে ঐর্যের কুবের হওয়ার ব্যাকুল আগ্রহকে বাড়িয়ে মনোরাজ্যে দৌর্বল্য বৃদ্ধি করছি; রবীন্দ্রদৃষ্টিতে, ঐর্যের কুবের হওয়ার ব্যাকুল আগ্রহকে বাড়িয়ে মনোরাজ্যে দৌর্বল্য বৃদ্ধি করছি; আর সমাজকেও সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল করছি। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে, এখন টাকা সম্বন্ধে সমাজস্থ সকলেই অত্যন্ত বেশি সচেতন হয়ে উঠছে। সেইজন্য আমাদের সমাজে দীনতা এসেছে। ট াকা নেই এ'কথা স্বীকার করা সর্বাপেক্ষা লজ্জাকর বিষয় হয়ে উঠেছে। আন্তরিকতার অন্তদৃশ্য বাহ্যপ্রকাশের তীব্রতায় ঢাকা পড়েছে। সমাজের মঙ্গলময় কাজে আজ সাড়া পাওয়া যায়না -- সমাজের উন্নতিতে, রবীন্দ্রনাথের মতো, এই মানসিক দৃষ্টি বিভ্রম প াল্টাতে হবে। সত্যকার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হলে সমাজ বাঁচবে না।

স্বাভাবিক পরিবর্তনগুলিকে স্বীকার করে নিয়ে, আধুনিকতাকে মেনে নিয়েও সমাজের একটা বিশিষ্টতা রাখতে হবে। রবীন্দ্রাদর্শ সম াজে অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে স্বীকার করবে। রাজনৈতিক প্রভাব যেন না লাগে, বিভাগ থাকবে -- কিন্তু বিদ্বেষ যেন না থাকে, বিরোধ যেন না থাকে। স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে, কিন্তু বিলাস যেন না থাকে, আনন্দ থাকবে - উত্তেজনা যেন না থাকে।

সে সমাজের রূপাদর্শ হবেঃ--

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচচ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি।
যেথা তুচ্ছ আচারের মবালি রাশি
বিচারের স্রোত পথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌষের করেনি শতধা।"

টিকিয়া থাকাই এ'সমাজের বৈশিষ্ট্য নয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাই এর প্রধান প্রয়াস। সর্বশক্তির সঞ্চার ঘটান এ সমাজেরকাজ। সামঞ্জস্য ঘটাবে এ'সমাজ। তবে তার উৎস হবে ভারত আত্মার উচচারিত শাশ্বত বাণী - উৎসারিত প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা। রবীন্দ্রন াথের সমাজ মানুষের গুণগুলি বিকাশের সুযোগ দেয়। তাঁর দৃষ্টিতে সমাজই সঙঘবদ্ধতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাঁর মতে সমাজের শ্রে ষ্ঠত্ব ও আদর্শের মানদণ্ড -

"যেষাং তপ ব্রহ্মচর্য্যং
যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম।"